ইত্তেফাক

004

তারিখ ... ২৫।৭।৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ১২ কলাম ২ ...

# সেকালের লাইব্রেরী

মুহাম্মদ আবদুল আজীজ শেখ

মানুষের মনের ভাবনা-চিন্তাকে স্থায়ীভাবে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই লেখার জন্ম। এই লিখে রাখা বিষয়গুলো যাতে সহজে নষ্ট হয়ে না যায়—সেগুলো যাতে অনেক দিন ধরে টিকে থাকে এবং দরকার মত সহজে ব্যবহার করা চলে, সে চিন্তাও মানুষের মাথায় এসেছিল অনেক দিন আগে। আর এ রকমের চিন্তা-ভাবনা থেকেই একদিন সৃষ্টি হয়েছিল লাইব্রেরীর।

দুনিয়ার যে সব জায়গায় সবার আগে লেখার চলন হয়েছিল, মিসর ছিল তার মধ্যে একটি। কাজেই সে কালের মিসরেই যে প্রথম লাইব্রেরী গড়ে উঠেছিল, তা মনে করা ভুল হবে না। পিরামিডের কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো। মিসরের লোকেরা মৃতের কবরের ওপর বানিয়েছিল এই সব বিরাট পাথরের ঘর। পিরামিডের ভেতরে মৃতের কামরা থেকে অন্যান্য বহু জিনিসের মধ্যে বের হয়েছে অনেক বই-পত্র। প্যাপিরাসে লেখা হতো সেসব বই। নানান বিষয়ের বই পাওয়া গেছে এসব জায়গা থেকে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে লাইব্রেরী বলতে যা বোঝায়, তা পাওয়া যায়নি পিরামিডে। পুরনো কালের দুটো নামকরা লাইব্রেরীর কথা এখন তোমাদের বলছি।

## আসুরবানিপালের লাইব্রেরী

ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস—এই দুটো নদীর মাঝামাঝি পলিমাটি দিয়ে গড়া যে জায়গাটা রয়েছে, অনেক দিন আগে তাকেই বলা হতো সুমেরিয়া। পণ্ডিতেরা মনে করেন, এই সুমেরিয়ার লোকজনই সবার আগে সভ্য হয়েছিল। সে আজ প্রায় ছয় হাজার বছর আগের কথা। তাদের সভ্যতার ধারা বজায় রেখে পরে ব্যাবিলনীয় এবং আরো পরে আসিরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ঐ একই জায়গায়। সুবিধের জন্যে ইতিহাসে এই তিন সভ্যতার সাধারণ নাম দেয়া হয়েছে মেসোপটেমিয়া সভ্যতা।

যীশু খৃষ্টের জন্মের প্রায় সাতশ' বছর আগের কথা। আসিরিয়ার রাজা আসুরবানিপাল এখানে গড়ে তুলেছিলেন এক বিরাট রাজ্য। রাজধানী ছিল তাঁর নিনেভে। আসুরবানিপাল ছিলেন খুবই শক্তিশালী রাজা। খুব নাম-ডাক ছিল তাঁর। যুদ্ধ করে তিনি তাঁর রাজ্যের সীমানা অনেক বাড়িয়ে ফেলেছিলেন। অতবড় রাজ্যের নানা জায়গা থেকে লুট করে আনা ধন-সম্পদে রাজধানী নিনেভেকে তিনি করে তুলেছিলেন খুবই সুন্দর ও সম্পদশালী। রাজ্য জয়ের ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই কঠোর। এ-ব্যাপারে মায়া-মমতা বলে তাঁর কিছু ছিল না। অথচ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার বেলায় তিনি ছিলেন একেবারে অন্য মানুষ। এ কাজে তাঁর উৎসাহ ও আগ্রহের সীমা ছিল না। তিনিই নিনেভেতে গড়ে তুলেছিলেন সেকালের সবচাইতে বড় লাইব্রেরী। শোনা যায়, এটি আরম্ভ করেছিলেন তাঁর পিতামহ সেনাকেরিব। যতদূর জানা যায় তাতে মনে হয়, এই-টিই দুনিয়ার প্রথম লাইব্রেরী। আসুরবানিপাল এর নাম দিয়েছিলেন "বিৎসুম্মি" বা জ্ঞান-ভবন।

অনেকটা এখনকার লাই-

ভালো অবস্থায়। ১৮৫০ সালে পুরনো ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নামকরা ইংরেজ পণ্ডিত হেনরী লেয়ার্ড সেকালের নিনেভে শহরের মাটি খুঁড়ে আসুরবানিপালের এই লাইব্রেরীটি বের করেন। এখান থেকে পাওয়া গেছে প্রায় বাইশ হাজার মাটির ফলক। এই ফলক বা চাকতিগুলোই সে কালের বই। বইগুলো প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে মাটির নীচে চাপা পড়েছিল। লাইব্রেরীটি তৈরী হয়েছিল প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে। কিন্তু এতে

ব্রেরীর মতই এখানকার কাজকারবার চলতো। লাইব্রেরীয়ানকে বলা হতো "লিখিত চাকতির মানুষ"। কারণ বই বলতে তখন লিখিত চাকতি বুঝাতো। প্রধান লাইব্রেরীয়ানের অধীনে কুড়ি অথবা তারও বেশী লিপিকর বা কেরানী মাটির চাকতিগুলো সাজানো-গোছানোর কাজ করতো।

চাকতিগুলো বিষয় অনুসারে সাজানো থাকতো। এমনকি আজকের দিনে যেমন লাইব্রেরীর বইয়ে নম্বর দেয়া হয় সে-সব চাকতির ওপরও তেমনি চিহ্ন দেয়া হতো। প্রতিটি কামরায় কি ধরনের পড়ার বিষয় থাকতো, সে সবের তালিকা রাখা হতো ঐ কামরার দরজা বা দেয়ালের ওপর। কি সুন্দর সব ব্যবস্থা, ভাবলে অবাক হতে হয়।

দুঃখের বিষয় আসিরীয় সভ্যতা খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে যুদ্ধ-বিগ্রহে নষ্ট হয়ে যায়। সেই সঙ্গে আসুরবানিপালের এই বিরাট লাইব্রেরীটিও ধ্বংস হয়ে যায় একই সময়ে। পোড়া মাটির চাকতিগুলো ছিল কিন্তু খুব মজবুত। তাই হাজার হাজার চাকতি প্রায় আড়াই হাজার বছর পরেও মাটির তলা থেকে খুঁড়ে বের করা গিয়েছে

যে চাকতিগুলো ছিল তার বেশীর ভাগ আরও প্রায় দু'হাজার বছর অর্থাৎ কিনা আজ থেকে মোটমাট প্রায় চার সাড়ে চার হাজার বছর আগেকার। প্রায় পুরো লাইব্রেরীটাই এখন বৃটিশ মিউজিয়ামে রেখে দেয়া হয়েছে খুবই যত্নের সঙ্গে।

মাটির তলা থেকে খুঁজে বার করা এই হাজার হাজার মাটির ফলকে পাওয়া গেছে কবিতা, ইতিহাস, বিজ্ঞান আর গণিত শাস্ত্র। আরও পাওয়া গেছে, সরকারী ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দলিলপত্র, ধর্মের বই ও রাজরাজড়াদের চিঠিপত্র। এছাড়া পাওয়া গেছে সুমেরীয় ভাষার ব্যাকরণ ও সুমেরীয়-আসিরীয় অভিধান। এত সব বিষয়ে লেখা এক সঙ্গে পাওয়ার ফলেই সুমেরীয় ভাষায় লেখাগুলোর মানে খুঁজে বের করা সম্ভব হয়েছে। একটি সুন্দর কাব্য অর্থাৎ কবিতায় লেখা কাহিনী পাওয়া গেছে আসুরবানিপালের লাইব্রেরী থেকে। নাম "গিলগামেশ"। আসল কাব্যটি বারোখানা মাটির চাকতিতে সব সমেত ৪৫০ লাইনে লেখা। গিলগামেশ ছিলেন একজন সুমেরীয় রাজা। তাঁকে নিয়েই এই কাব্য। মনে করা হয় এটাই পৃথিবীর সবচাইতে পুরনো কাব্য।

মাটির নিচ থেকে পৃথিবীর এই সবচেয়ে পুরনো লাইব্রেরী বেরিয়ে পড়ার ফলেই আমরা সেকালের মেসোপটেমিয়ার চালচলন, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, রাজরাজড়ার কাহিনী এবং আরো অনেক কিছু জানতে পারি। তখনকার দিনে এতবড় একটা লাইব্রেরী গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল আসুরবানিপালের নিজের আগ্রহ আর চেষ্টার ফলেই। তাঁর বিশাল রাজ্যে সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয় আর আসিরীয় আমলের যতগুলো লেখা ফলক যোগাড় করা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল, তিনি তার সবই আনিয়েছিলেন তাঁর লাইব্রেরীতে। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার একজন রাজার জ্ঞান চর্চার জন্য যে এতটা আগ্রহ থাকতে পারে তা ভাবলে আজকের দিনেও আমাদের অবাক হতে হয়।

## আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরী—

তোমরা নিশ্চয়ই গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের নাম শুনেছো। তিনি দুনিয়ার অনেক দেশ জয় করেন। ভারত উপমহাদেশের কয়েকটি রাজ্যও তিনি দখল করেন। তাঁর জয় করা দেশের মধ্যে মিসর ছিল একটি। তাঁর নাম অনুসারেই আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩১ সালে মিসরে ভূমধ্য সাগরের তীরে আলেকজান্দ্রিয়া শহরের পত্তন হয়। আলেকজাণ্ডার মারা যাবার পর তাঁর বিরাট রাজ্য তাঁর তিন সেনাপতি ভাগ করে নেন। মিসর পড়লো সেনাপতি টলেমী সোটরের ভাগে।

তোমরা সবাই জানো, আলেকজাণ্ডার একজন বিখ্যাত বীর ছিলেন। কিন্তু তোমরা মনে হয় জানো না যে, তিনি একজন জ্ঞানী ও গুণী লোকও ছিলেন। গ্রীস দেশের প্রখ্যাত দার্শনিক অ্যারিষ্টটলের তিনি ছাত্র ছিলেন। একটানা বারো বছর তাঁর কাছে লেখাপড়া শেখেন আলেকজাণ্ডার। সেনাপতি টলেমীও ছিলেন অ্যারিষ্টটলের ছাত্র। তিনি আলেকজাণ্ডারের সহপাঠী ও খুবই অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। টেলেমী ভালভাবেই জানতেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় আলেকজাণ্ডারের আগ্রহের সীমা ছিল না এবং এ জন্য অনেক টাকা-পয়সাও তিনি খরচ করেন। আলেকজাণ্ডার যে কাজ শেষ করে যেতে পারেননি, টলেমী সেই কাজের ভার নিজের হাতে তুলে নিলেন।

আলেকজান্দ্রিয়া নগরীতে টলেমী গড়ে তুললেন মিসরের নতুন রাজধানী। আর আজ থেকে দু'হাজার বছরেরও বেশী আগে সেখানে তৈরী করলেন বিজ্ঞান চর্চার একটি স্থায়ী কেন্দ্র। এই কেন্দ্রই হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম মিউজিয়াম। এখানে রাজার আশ্রয়ে থেকে সরকারী খরচে যাতে জ্ঞানী-গুণী লোকেরা নিশ্চিন্তে জ্ঞান চর্চা করতে পারেন তার যাবতীয় ব্যবস্থা টলেমী বেশ ভালভাবেই করে দিয়েছিলেন। পড়াশুনার সুবিধের জন্যে এখানে গড়ে তোলা হয়েছিল বিরাট এক লাইব্রেরী। কম করে হলেও সাত লক্ষ বই ছিল আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরীতে। টলেমী সোটর ও তাঁর ছেলে টলেমী ফিলাডেলফাসের আমলে লাইব্রেরীটি সেকালের সবচেয়ে নামকরা লাইব্রেরী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দূর-দূরান্ত থেকে পুঁথিপত্র জোগাড় করে আনা হয়েছিল এর জন্যে। আর সেসব ব্যবহারের জন্যে চারদিক থেকে এসে ভীড় করতেন পণ্ডিতের দল। দিনরাত পড়াশুনা করার ব্যবস্থা ছিল এই লাইব্রেরীতে। তখনকার নামকরা জ্ঞানী লোকেরা এর লাইব্রেরীয়ান হিসেবে কাজ করেছেন। এখানে পড়াশুনা করে কত পণ্ডিত কত বিজ্ঞানী যে কত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল পৃথিবীকে দিয়ে গেছেন, তা বলে শেষ করা যায় না। জ্যামিতিশাস্ত্রের জনক ইউক্লিড আলেকজান্দ্রিয়ার মিউজিয়ামের অধ্যাপক ছিলেন। প্রাচীনকালের সবচেয়ে নামকরা বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস এখানে লেখা-পড়া শেখেন।

মনে রাখা দরকার, সেকালের বই কিন্তু আজকের দিনের বইয়ের মত ছিল না মোটেই। আজকের দিনে যে কাগজে আমরা লিখি, তা তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। পাথর, ব্রোঞ্জ এবং নানা ধাতুর পাতে লেখা, পার্চমেণ্ট কাগজ ও প্যাপিরাসের মোড়ক ইত্যাদি নানা ধরনের জিনিসই ছিল সেকালের বই। শোনা যায় আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরীতে শুধুমাত্র প্যাপিরাসের 'বই' ছিল সাত হাজারেরও বেশী। যখন কাগজ আবিষ্কৃত হয়নি, ছাপাখানা কি বস্তু তা মানুষের সম্পূর্ণ অজানা, একটা বই নকল করাতে গেলে অনেক খরচ-খরচার ব্যাপার—সেই সময়ে এত বড় লাইব্রেরী গড়ে তোলা কম কথা নয়।

বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা এত নাম ডাক যে লাইব্রেরীর, তা টিকে ছিল মাত্র দেড়শ' বছর কি তারও কম। রোম সম্রাট জুলিয়াস সীজারের সৈন্যেরা খৃীস্টপূর্ব ৪৭ সালে যখন মিসর আক্রমণ করে, সেই সময় মনে হয় এই মিউজিয়াম ও লাইব্রেরী ধ্বংস হয়ে যায়। আজ আর এর কোন চিহ্নই অবশিষ্ট নেই।

---

## জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখের দৈনিক বাংলায় জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র সম্পর্কে বিশেষ প্রতিনিধির প্রতিবেদনে নির্ভরযোগ্য মহলের বরাত দিয়ে জানানো হয়েছে যে সরকার জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রকে বাংলা একাডেমীর সঙ্গে একীভূত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আরও জানানো হয়েছে যে, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের মতে, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র ও বাংলা একাডেমীর কাজ 'অনুরূপ' বলে ব্যয়-সংকোচের জন্যে ঐ দুটি প্রতিষ্ঠানকে একীভূত করার প্রয়োজন অনুভব করা হচ্ছে। এ খবর পড়ে আমি এবং আরও অনেকে স্তম্ভিত হয়েছি।

সঙ্গত কারণেই ধারণা করা হচ্ছে যে, ঐ দুটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার মূলে কী উদ্দেশ্য ছিলো, তাদের বর্তমান কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচী ইত্যাদি সম্পর্কে ভালোভাবে অনুসন্ধান না করেই কতিপয় কর্মকর্তার পেশকৃত 'একীভূত' করার মাধ্যমে ব্যয়-সংকোচের এই উদ্ভট সুপারিশ মেনে নেওয়া হয়েছে।

জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো এই অঞ্চলে প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য গ্রন্থের মানোন্নয়ন, সুলভ মূল্য ও অধিক সংখ্যায় প্রকাশনা নিশ্চিত করার জন্যে। একদিকে লেখক, প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতাদের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলোর সমাধান খুঁজে বের করার এবং প্রয়োজনবোধে লেখক প্রভৃতিদের পেশাগত মানোন্নয়নের জন্যে সেমিনার, কর্মশিবির ও প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন যেমন এই কেন্দ্রটি করে থাকে, তেমনি পাঠকদের চাহিদা সযত্নে জরিপ করে তাদের যাচিত গ্রন্থসমূহের সরবরাহও নিশ্চিত করে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সীমাবদ্ধ সামর্থ্য সত্ত্বেও সমগ্র বাংলাদেশে গ্রন্থ-প্রকাশনা ও বিপণনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এ প্রসঙ্গে এদেশের শিক্ষিত সমাজ এটা ভালো করেই জানেন যে, এদেশে সম্প্রতি সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে গ্রন্থ প্রকাশনার হার আশংকাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং তার ফলে দেশে সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাও মারাত্মভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এই নিদারুণ সংকটকালে যেখানে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা নিতান্ত প্রয়োজন ছিলো, সেখানে প্রতিষ্ঠানটির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলোপ করার কথা ভাবা হচ্ছে।

পক্ষান্তরে বাংলা একাডেমী ১৯৫৫ সালে স্থাপিত হয়েছিলো প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যে যে, এটি ক্রমে ক্রমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণা ও আলোচনার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠবে। কিন্তু, একাডেমী বর্তমানে গবেষণা, সংকলন, অনুবাদ, গ্রন্থাগার, সংস্কৃতি ছাড়াও ফোকলোর, পাঠ্যপুস্তক, পরিকল্পনা, প্রকাশন ও বিক্রয় প্রভৃতি অপ্রয়োজনীয় বিভাগের বোঝা নিয়ে একটি স্থবির প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এর মুদ্রণশাখাটিও 'শ্বেতহস্তী' হিসাবে চিহ্নিত। গ্রন্থ-প্রকাশনার সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়ন এবং গ্রন্থ-বিপণনের ক্ষেত্রে একাডেমীর প্রত্যক্ষ কার্যক্রম বলতে গেলে, তেমন কিছুই নেই।

আমি আশা করছি, সরকার পরিস্থিতি সম্যকরূপে অনুধাবন করে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখবেন।

—আবু শাহরিয়ার,
১০১, নাজিমুদ্দিন রোড, ঢাকা-১।

॥ ২ ॥

উন্নয়নকামী আমাদের এই বাংলাদেশের নানা ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তথাপি সর্বক্ষেত্রেই তা সমীচীন বলে মনে হয় না। গত ১৩ই সেপ্টেম্বর জাতীয় দৈনিকসমূহে প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকে জানা যায় যে সরকার জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রকে বাংলা একাডেমীর সঙ্গে একত্রিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

বাংলা একাডেমী আমাদের জাতিসত্তার পরিচয়বাহী এক অনন্য প্রতিষ্ঠান। আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধনে এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ভূমিকা পালন করাও সুকঠিন। এমতাবস্থায় আরেকটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে এর অঙ্গীভূত করলে সেই ভূমিকা আরও কঠিন হয়ে উঠবে বলে আমরা মনে করি।

প্রসঙ্গত, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আমাদের জাতীয় মর্যাদার অন্যতম প্রতীক। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে গ্রন্থ প্রকাশনা, গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব, গ্রন্থমেলার আয়োজন, গ্রন্থ সুহৃদ সমিতি প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র দেশময় একটি সচেতন পাঠক শ্রেণী গড়ে তোলার ব্যাপারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

এই প্রেক্ষিতে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র এক স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবেই বিদ্যমান থাকুক এটাই বাঞ্ছনীয়। অতএব সরকার এই প্রতিষ্ঠানটিকে বাংলা একাডেমীর সঙ্গে একত্রিত করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, তা পুনর্বিবেচনা করার জন্যে আমরা বিশেষ অনুরোধ জানাই।

—হাসনাইন খুরশেদ,
মানবিক বিভাগ,
ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারী কলেজ,
ব্রাহ্মণবাড়িয়া।